### নিউইয়র্ক

# বঙ্গবন্ধুর ‘জয় পাকিস্তান’ স্লোগান

নিউইয়র্ক থেকে **মনজুর আহমদ**

নিউইয়র্কের প্রবাস জীবনে সাপ্তাহিক ২০০০ নিয়মিত পেয়ে থাকি। এতে পড়লাম বঙ্গবন্ধুর ‘জয় পাকিস্তান’ স্লোগান নিয়ে শামসুর রাহমানের ভ্রান্তি এবং আলী যাকেরের সংশোধনী। পড়লাম আরো কারো কারো চিঠি যাতে কেউ কেউ দাবি করেছেন ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ‘জয় পাকিস্তান’ (কারো কারো দাবি ‘জিয়ে পাকিস্তান’) স্লোগান নাকি তারা নিজের কানে শুনেছেন।

তেত্রিশ বছর পর এসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক দেখে হাসিও পায় দুঃখও লাগে। বিস্মিত হতে হয় তাদের ভূমিকায় যারা সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা শ্রোতা, যারা এমন একটি প্রকাশ্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিতে ইন্ধন দিয়ে চলেছেন।

বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এটি নয়। যে কথাটি বলার জন্য আমার এই লেখা তা হলো, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের জনসভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম এবং আমার উপস্থিতি ছিল সাধারণ একজন শ্রোতা হিসেবে নয়, আমার উপস্থিতি ছিল সেদিনের সর্ববৃহৎ দৈনিক পত্রিকা ‘দৈনিক পাকিস্তান’ (পরবর্তীতে ‘দৈনিক বাংলা’)-এর স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে। জনসভা ও বক্তৃতার বিবরণ সংগ্রহ করাই ছিল আমার এবং অন্যান্য সাংবাদিকদের দায়িত্ব। এই গুরুদায়িত্ব পালনে চোখ কান সারাক্ষণ সজাগ রাখতে হয়েছে। সেই দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট করেই বলতে চাই, বঙ্গবন্ধুর ‘জয় পাকিস্তান’ স্লোগান আমরা কেউ শুনিনি। পরদিনের কোনো পত্রিকাতেই এর কোনো উল্লেখ নেই। বক্তৃতার পুরো নোট ছাড়াও আমাদের অনেকেই সে বক্তৃতা টেপ করেছিলেন। রাতে রিপোর্ট লেখার সময় সেই টেপ বাজিয়ে আমরা নোট মিলিয়ে নিয়েছিলাম। না, ‘জয় পাকিস্তান’ কোথাও ছিল না। ছিল না বলেই পরদিনের পত্র-পত্রিকার সুবিস্তৃত বিবরণীতে কিংবা ওই জনসভা সংক্রান্ত আরো অসংখ্য ছোট বড় প্রতিবেদনে এর কোনো উল্লেখও ছিল না।

এ সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্যটি হচ্ছে, ৭ মার্চ নয়, বঙ্গবন্ধু ‘জয় পাকিস্তান’ স্লোগান দিয়েছিলেন একাত্তরের ৩ জানুয়ারির জনসভায়। ’৭০-এর নির্বাচনে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী আওয়ামী লীগ এদিন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজন করেছিল এক বিশাল জনসভার। উপলক্ষ ছিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ। জনসভার মঞ্চটি ছিল আকর্ষণীয়- বিশাল ও সুদৃশ্য নৌকা। এই জনসভাতেই প্রাথমিক পর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে আকাশে পায়রা ওড়াতে গিয়ে যখন একটি পায়রা না উড়ে বঙ্গবন্ধুর হাতেই বসে রইল তখন তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, ‘ওরা আমায় ছাড়তে চায় না।’

জনসভাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সব সদস্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একটি লিখিত শপথনামা পাঠ করেছিলেন। শপথনামাটির সাইক্লোস্টাইল কপি সব সদস্যকে দেয়া হয়েছিল। সাংবাদিকদের মধ্যেও বিতরণ করা হয়েছিল এর কপি। এই শপথনামার শেষে লেখা ছিল দুটি স্লোগান। বামে ‘জয় পাকিস্তান’ এবং ডানে ‘জয় বাংলা’। এদিনের বক্তৃতাও বঙ্গবন্ধু শেষ করেছিলেন ‘জয় বাংলা’ ও ‘জয় পাকিস্তান’ বলে। পরদিন ৪ জানুয়ারির পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জনসভার প্রতিবেদন ও বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার বিবরণীতে এর উল্লেখ ছিল। যারা এ বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী তারা একাত্তরের ৪ জানুয়ারির সংবাদপত্রগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করলেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আশা করি অবান্তর হবে না। অভ্যাস অনুযায়ী আমি পুরনো কাগজপত্র বিশেষ করে বক্তৃতার নোট বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি-বক্তব্য ফেলে না দিয়ে জমা করে রেখে দিতাম। ৭ মার্চ তো বটেই, ৩ জানুয়ারিরও সেই শপথনামার কপি এবং বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার নোট আমার ড্রয়ারে কাগজপত্রের মধ্যে ছিল। ’৯৮-এর ৩০ অক্টোবর তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ‘দৈনিক বাংলা’ বন্ধ ঘোষণা ও দৈনিক বাংলা ভবন থেকে আমাদের বিতাড়নের সময় এগুলো কিছুই সঙ্গে আনা সম্ভব হয়নি। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এগুলি সবই আঁস্তাকুড়ে স্থান পেয়েছে।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ‘জয় পাকিস্তান’ স্লোগান যারা নিজের কানে শুনেছেন বলে দাবি করছেন তাদের একজন তার বাল্যে কুষ্টিয়ায় বসে রেডিওতে এ ভাষণ শুনেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট করে তিনি বলতে পারেননি কবে এবং কখন ঢাকা বেতার এ ভাষণ প্রচার করেছিল। তার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ ঢাকা বেতার প্রচার করেছিল পরদিন ৮ মার্চ সকালে। আমিও সে প্রচার শুনেছিলাম। সেখানেও কোথাও ‘জয় পাকিস্তান’ ছিল না। ভদ্রলোক ‘নিজের কানে শোনার’ এতো বড় একটা দাবি করলেন কিভাবে ভাবতেও অবাক লাগে।

একজন মন্ত্রীর দাবি আরো হাস্যকর। তিনি বলেছেন, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ‘জয় পাকিস্তান’ বলেছিলেন, তবে আস্তে বলেছিলেন।

মন্ত্রী মহোদয় রাজনীতি করেন। রাজনৈতিক স্বার্থে অনেক কথা তাদের বলতে হয়। তবে একজন রাজনীতিকের পক্ষে এই বাস্তবতা অনুধাবন করা নিশ্চয় কষ্টকর নয় যে, একাত্তরের সেই বিক্ষুব্ধ উত্তাল দিনগুলোতে যখন পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবে টগবগ করছে সারা দেশের মানুষ, যখন পাকিস্তানের পতাকায় আগুন দিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে বাড়িতে বাড়িতে, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা, সেই আগুন ঝরা মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু কেন, সাধারণ স্তরের কোনো রাজনীতিকের পক্ষেও ‘জয় পাকিস্তান’ বলার মতো আহাম্মকি করা সম্ভব ছিল না।

---

### দ: কোরিয়া

## অতি অলঙ্কার দৃষ্টিকটু

আমি বাংলাদেশের নাগরিক নাগরিক। হিসেবে দেশের সার্বিক অবস্থার কারণে বহির্বিশ্বে নিজেকে এমনিতে ছোট মনে হয়। তারপরও দেশের শিল্পীদের সংস্কৃতির নামে বিভিন্ন অঙ্গে অলঙ্কার ব্যবহার দেখে আরো দুঃখ হয়। যেমন কিছুদিন আগে BTV World-এর একটি আধুনিক গানের অনুষ্ঠান উপভোগ করছিলাম, সঙ্গে সহকর্মী কয়েকজন বিদেশী বন্ধুও ছিল। তারা আমাকে আমার দেশের মহিলা শিল্পীদের স্বর্ণসজ্জা দেখে প্রশ্ন করেছিল হাতে, পায়ে, নাকে, কানে, গলায় এতো কিছু কেন? বিদেশী বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তর কি দিতে পারি! দেশবাসী বা প্রবাসজীবন পাঠকের প্রতি অনুরোধ, আপনারা দিতে পারবেন উত্তর? সত্যিই নিজেকে সেদিন খুবই লজ্জিত মনে হয়েছিল। আসলে দেশের সংস্কৃতির নামে শিল্পীদের বিভিন্ন অঙ্গে স্বর্ণসজ্জা প্রদর্শনী বন্ধ করলে খুব খুশি হবো। সত্যিই দুঃখজনক যে আমরা এই আধুনিক বিশ্বে বসবাস করেও আদিম যুগের বেশভূষা পরিত্যাগ করতে পারি না।

**Bahauddin Ahamed Khokon, Song Su2GA 3 Dong**
**Sung dong gu, Seoul-S. Korea, Korea Ph-0198142478**

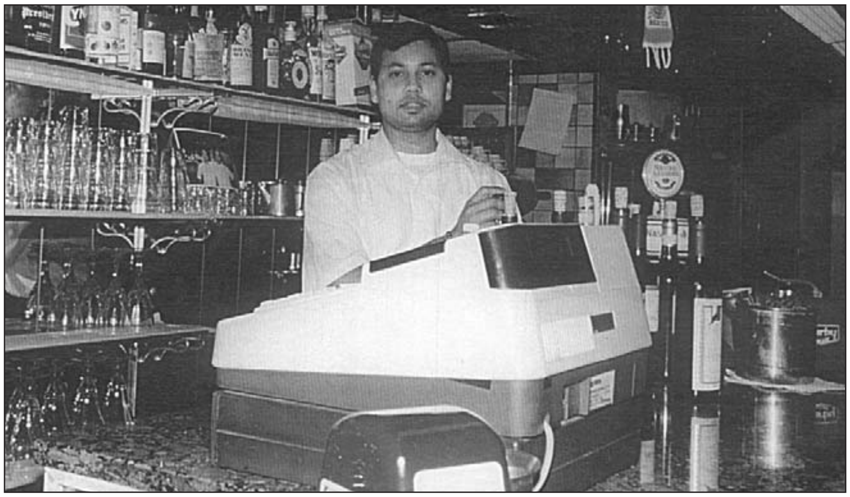

ইটালি

# বেকার হচ্ছে বাংলাদেশী অদক্ষ শ্রমিক

ইউরোপের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ ইটালিতে প্রবাসীদের জীবনযাত্রা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। দেখা দিয়েছে পর্যাপ্ত কাজের সংকট। বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রবাসী বেকারের সংখ্যা। অথচ কর্মসংস্থান অধিদপ্তর বলছে, ইটালিতে এখনো শ্রমিক সংকট রয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যুরো থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইটালির বিভিন্ন স্তরের কাজের জন্য যে পরিমাণ শ্রমিক প্রয়োজন (সিজন্যাল কাজসহ) সে তুলনায় প্রতিদিন কর্মসন্ধানীদের কম আবেদন জমা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। এদিকে বেসরকারি কর্মসংস্থান এজেন্সিগুলোয় প্রতিদিন যে পরিমাণ আবেদন জমা হচ্ছে, সে তুলনায় কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে খুবই কম। সব মিলিয়ে দেখা গেছে ইটালিতে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা থাকলেও অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য এখন কাজ পাওয়া কিছুটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে যারা কাজের অভাব বোধ করছেন, তার বিরাট একটা অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশীরা। কারণ বাংলাদেশী শ্রমিকের সিংহভাগই অদক্ষ।

## যে কারণে কর্মসংকট সৃষ্টি হয়েছে

কর্মসংকট সৃষ্টির প্রধান কারণ বিশ্ব অস্থিরতা। যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে মানুষের জীবনযাত্রা কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। যার প্রভাব পড়েছে বিশ্ব বাজারে। আগের তুলনায় উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বিশ্ব বাজারে কিছুটা কম হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। সুতরাং যেখানে পাঁচজন শ্রমিক প্রয়োজন সেখানে তিন জন দিয়ে কাজ শেষ করতে চাচ্ছেন তারা। এছাড়া চলতি বছরে ইসি'তে যুক্ত হয়েছে ইউরোপের নতুন ১০টি দেশ। এ দেশ থেকে অনেকেই উন্নত জীবনযাত্রার আশায় ইসি'র আশীর্বাদে সহজেই ইটালিতে প্রবেশ করছেন। এবং তারা অল্প বেতনে বিভিন্নভাবে কাজ করছেন। বিশেষ করে সিজন্যাল কাজগুলো প্রায়ই তাদের দখলে চলে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও চাচ্ছে ইসিভুক্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোর অর্থনীতি চাঙ্গা করে তুলতে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাদের সুযোগ-সুবিধা ইসি'র কল্যাণে কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়ীরাও আকৃষ্ট হচ্ছেন কম বেতনের শ্রমিকদের প্রতি।

## যে কারণে বাংলাদেশী শ্রমিক বেকার থাকছে

ইটালিতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বেকারত্বের প্রধান কারণ অদক্ষতা ও ভাষাগত সমস্যা। শতকরা ৯৫ জন বাংলাদেশীরই কোনো কাজের ওপর দক্ষতা নেই। সবাই অপেরাইও জেনেরিকো, অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিক। আর সাধারণ শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কোনো কর্মস্তর নেই। যখন যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে ব্যবহার করা হয় সাধারণ শ্রমিকদের। যে ক'জন দক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিক ইটালিতে আছেন, তারা প্রায় প্রত্যেকেই সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। এক সময় নিজের মেধা ও চেষ্টার ফলে কোনো একটি পেশায় নিজেকে দক্ষ করে করে তুলেছেন। কিন্তু যারা অদক্ষই রয়ে গেছেন তাদের জন্য একটি ভালো বেতনের নতুন কাজ জোগাড় কিছুটা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইটালির বিভিন্ন শহরের কর্মসংস্থান অফিস থেকে বিভিন্ন কাজের ওপর ফ্রি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দেশের দক্ষ শ্রমিকের অভাব মেটাতে বিভিন্ন সংস্থা বা কারিগরি স্কুল রয়েছে প্রবাসীদের প্রশিক্ষণের জন্য। এর অধিকাংশই ফ্রি। এমনকি কোনো কোনো সংস্থা বা স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীর থাকা খাওয়ার জন্যও অর্থ প্রদান করা হয়। এসব সংস্থা বা স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট ও কাজের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অথচ খুব কম সংখ্যক বাংলাদেশী আছেন যারা এসব সংস্থা বা স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। বাংলাদেশীদের আর একটা প্রধান সমস্যা  ভাষা না জানা। সম্পূর্ণ নতুন একটা ভাষা আয়ত্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়। এ জন্যও প্রচুর স্কুল রয়েছে। বিদেশীদের ইটালীয় ভাষা শেখাতে এসব স্কুল সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস দিয়ে থাকে। এমন কি কর্মজীবীদের জন্য সন্ধ্যার পর ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ অধিকাংশ বাংলাদেশীরা এসব স্কুলে গিয়ে ভাষা শেখে না। আমার জানা মতে ইটালিতে যতগুলো দেশের মানুষ বাস করেন তার মধ্যে ইটালীয় ভাষা সবচেয়ে কম জানা জাতি বাংলাদেশীরা। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কাজের জন্য আসেন অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। আসার পথে ব্যয় হয় বেশ মোটা অঙ্কের টাকা। এ টাকার যোগান দিতে অনেক সময় ধার দেনা, জমি বন্ধক রাখা বা বিক্রি করাসহ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হয়। বিদেশে এসেই সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক নতুন পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়। বাসা ভাড়া, খাওয়ার খরচ জোগাড় করতে তখনই ছুটতে হয় কাজের সন্ধানে। অপর দিকে দেশে ঋণের বোঝা বা পরিবারের অসচ্ছলতা তাড়া করে বেড়ায় সব সময়। এ কারণে কোনো স্কুল বা সংস্থায় গিয়ে ছাত্র হয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া হয় না। বাংলাদেশ থেকেও কোনো কাজের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে না বাংলাদেশীরা। নাম লেখায় সাধারণ শ্রমিকের খাতায়। কিন্তু ভাষার স্কুল তো রাতে মাত্র এক থেকে দু'ঘণ্টা। সেখানে যান না কেন বাংলাদেশীরা! হয়তো তখন আড্ডা, রাজনীতি বা কমিউনিটির দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই আর স্কুল করার সময় হয় না।

## কেমন যাচ্ছে বেকারদের দিন

প্রবাসের একমাত্র আপন বন্ধু একটি ভালো কাজ। এ কাজটি যখন না থাকে তখন প্রবাসীরা খুব অসহায় বোধ করেন। কর্মসংস্থান এজেন্সিগুলোর দ্বারে দ্বারে ঘোরেন একটা ভালো কাজের  জন্য। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অপেক্ষা করেন কখন একটা ফোন আসে। একটা কাজের সন্ধান পেলেই ছুটে যান। হয়তো অনেক সময় গিয়ে দেখেন তার আগেই অন্য কেউ পৌঁছে গেছে। কাজ থাকলে একটা বাঁধা নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। কিন্তু কাজ না

থাকলে সময়টা চলে এলোমেলো। অনেকে অসহায়ত্ব ঘোচাতে। এ সময় দেশে ফোন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেন। যা অন্য সময় ইচ্ছা করলেও সময়ের অভাবে পারেন না। কিন্তু বিপত্তি হয় হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে। কারণ থাকা খাওয়াসহ অন্যান্য সব মিলিয়ে প্রতিমাসে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতেই হয়। এছাড়া অনেকেই প্রতিমাসের বেতন থেকে দেশে সংসার খরচ পাঠান। এ সময় তাদের জন্য যোগ হয় বাড়তি এক যন্ত্রণা। কারণ দেশের মানুষ প্রবাসীদের দুঃখ-কষ্ট, সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে চায় না। তারা মনে করে প্রবাস মানেই টাকা। দুঃখ-কষ্ট, সুখ-অসুখের উর্ধ্বে এক অন্যজীবন। সব মিলিয়ে প্রবাসী বেকারদের সময় কাটে প্রচন্ড যন্ত্রণার মধ্যে। এ বেকারত্ব অনেক সময় তিন থেকে ছ'মাসও ছাড়িয়ে যায়।

### যারা প্রবাসী হতে চান

বাংলাদেশ থেকে যারা কাজের জন্য বিদেশে আসতে চান, তারা অবশ্যই একটি কাজ শিখে আসুন। ছোট বড় দামী-অদামী না ভেবে যেকোনো একটা কাজ শিখুন। কোনো কাজই ছোট বা লজ্জার নয়, যদি সেখানে অন্যায় শব্দটি না থাকে। সুতরাং যেকোনো একটি হাতের কাজ শিখুন। তাহলেই বিদেশে আসার উদ্দেশ্যটা সহজে সফল হবে। অন্যথায় পিছিয়ে যেতে হবে অনেক। নাম লেখাতে হবে সাধারণ শ্রমিকের খাতায়। মাড়াতে হবে নিত্য নতুন উটকো ঝামেলা। ইটালিতে সকল প্রকার কাজেরই মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো একটা টেকনিক্যাল কাজ জানা থাকলে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি এখানে খুব একটা প্রয়োজনে আসবে না, যদি কোনো কাজের ওপর দক্ষতা না থাকে। কারণ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। শুধু পুঁথিগত শিক্ষানির্ভর সার্টিফিকেটের মূল্য ইটালিতে নেই বললেই চলে। তার অর্থ শিক্ষার প্রয়োজন নেই এমন নয়। অবশ্যই শিক্ষার মূল্য পৃথিবীর সবখানে আছে। তবে তার ব্যবহার জানা চাই। বাংলাদেশে শিক্ষার সঠিক ব্যবহার নেই বলেই গোটা দেশ অনিয়মে দুলছে। যদি শিক্ষার শুদ্ধ ব্যবহার হতো তবে বেকারত্বের মহামারী সৃষ্টি হতো না। নাপিত পাট কাটে আর ধোপা রাজনীতি করে- এমন উদ্ভট দৃশ্য দেখতে হতো না। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার সার্টিফিকেটধারী যুবক বেরিয়ে আসছে, অথচ কেউ কোনো কাজ জানে না। এটা কোনো জাতির জন্য সাফল্য বয়ে আনতে পারে না। সুতরাং যুবকরা সহজ কাজটাই করছে সহজে। অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, খুন, রাহাজানি এবং বাংলাদেশী রাজনীতি। যারা এ বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে চান, তারা দশটা নয়, অন্তত একটি কাজ শিখুন এবং ভালোভাবে শিখুন। এখানে মেটাল মেকানিক, মোটর মেকানিক, ঝালাই, ইলেকট্রনিক ইনটেরিয়র, হেয়ার ড্রেসিং, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রির সার্ভিসিং, হোটেল, রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন কাজ, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, পেইনটিং, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন কাজের চাহিদা রয়েছে। শুধু পুরুষরা নয়, নারীরাও শিখতে পারেন যেকোনো একটা কাজ। অন্তত নারী-পুরুষ সবাই রান্না ও ড্রাইভিংটা শিখে আসুন। এটা অন্যের জন্য নয়, বিদেশে নিজের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন।

**পলাশ রহমান, ইটালি**

**Palashrahman@libero.it**

---

টোকিও

# কফিনে মোড়া অশ্রুবিন্দু

বাংলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী সত্যনিষ্ঠ বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ুন আজাদ। একাধারে তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যকার, ভাষাবিজ্ঞানী ও শিশু সাহিত্যিক। বিপুল তাঁর রচনা সম্ভার। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা এ বছর ১০ ফেব্রুয়ারি একুশের বইমেলায় আগামী প্রকাশনীর স্টলে। এক মাসের ছুটিতে দেশে গিয়েছিলাম। ঢাকার শ্রাবণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত আমার ছড়ার বই 'চাঁদ বুড়ি ডট কম' তাঁকে দিলাম। ভক্ত পরিবেষ্টিত হুমায়ুন আজাদ তাঁর সদ্য প্রকাশিত আলোচিত ও বিতর্কিত উপন্যাস 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' আমাকে দিলেন। বইয়ের প্রথম পাতায় লিখলেন- 'বদরুল বোরহানের জন্য শুভেচ্ছা।' তাঁর সেই শুভেচ্ছা নিয়ে তার একদিন পরেই জাপান চলে আসি। তার কিছুদিন পরেই প্রবাসে বসে শুনলাম হুমায়ুন আজাদের আক্রান্ত হবার সংবাদ। এই সংবাদে আমি ব্যথিত হলেও অবাক হইনি। কারণ, অনেকের মতো এ রকম একটা আশঙ্কা আমিও করছিলাম। যে দেশে প্রধানতম কবি শামসুর রাহমান নিজ বাসভবনে আক্রান্ত হন, সময়ের সাহসী সাংবাদিক সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজাকে কাফনের কাপড় পাঠানো হয়, সেখানে হুমায়ুন আজাদ আক্রান্ত হওয়া ছিলো শুধু সময়ের ব্যাপারে। ২০০৩ সালে হুমায়ুন আজাদের 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না' ও 'আব্বুকে মনে পড়ে' শিশু-কিশোরতোষ এই উপন্যাস দুটি জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়। তাতে আমি ক্ষুদ্র একটি ভূমিকা পালন করি। জাপানি অনুবাদক মিসেস কিকো সুজুকিকে তাঁর সঙ্গে ফোনে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং অনুবাদের অনুমতি লাভে সহায়তাসহ মিসেস সুজুকির বাংলাদেশ গমন সংক্রান্ত সংবাদ হুমায়ুন আজাদকে অবহিতকরণ ইত্যাদি। এই ভূমিকাটি পালন করতে পেরে আমি আনন্দিত। কারণ, বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের বই জাপানি ভাষায় অনুবাদ হবে, সেটা আমার জন্য ছিলো অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের ব্যাপার।

হুমায়ুন আজাদ ছিলেন সময়ের নির্ভীক, স্পষ্টভাষী এক শব্দ সৈনিক। একদিকে ছিলেন তিনি নন্দিত, আবার পাশাপাশি ছিলেন নিন্দিত ও বিতর্কিত (গ্রন্থ-'নারী' ১৯৯২)। যা বলার তা সরাসরি বলে ফেলার মতো সৎ সাহস ছিলো তাঁর। কোনো রাজনৈতিক দলের সরাসরি সমর্থক ছিলেন না তিনি। কাউকে বা কারো তোয়াক্কা বা তোষামোদ করতেন না। এখানেই হুমায়ুন আজাদের বিশেষত্ব। আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা প্রায় সবাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। উচিত কথা বলতে তিনি কাউকে ছাড় দিতেন না। তাঁর অনেক বক্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করলেও তাঁর সম্পর্কে ছিলো সবার  অদম্য কৌতূহল। তাঁর উপন্যাসগুলো হট্ কেকের মতো বিক্রি হয়ে যেতো।

হুমায়ুন আজাদ 'বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়'। 'অলৌকিক ইস্টিমার'-এ চড়ে তিনি দেখলেন 'ছাপ্পান্ন হাজার 'বর্গমাইল'-এর দেশটি 'প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নীচে' অবস্থান করছে। চারদিকে 'জলপাই রঙের অন্ধকার'। 'সবকিছু ভেঙে পড়ে', 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।' 'মহাবিশ্ব'-এ 'কবি অথবা দন্ডিত অপুরুষ' ছাড়া বাকি সব 'নারী' বা 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'। 'নিবিড় নীলিমা'য় 'মাতাল তরণী, 'নরকে অনন্ত ঋতু'। আকাশের বুকে 'ফালি ফালি করে কাটা চাঁদ'। 'শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্ত জবা'। কবে আসবে 'আমাদের শহরে একদল দেবদূত?' কে জ্বালাবে 'লাল-নীল দীপাবলী'? 'বুক পকেটে জোনাকি পোকা' নিয়ে আমরা অপেক্ষমাণ। আমাদের মাথা মোটা 'রাজনীতিবিদগণ' দিগ্‌ভ্রান্ত। 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম'? 'মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে' থেকেও আমরা আমাদের 'সীমাবদ্ধতার সূত্র'কে ছিঁড়তে পারি না। তাই হুমায়ুন আজাদকে বলতে হয়- 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।' আমাদের দু'চোখে আজ 'কফিনে মোড়া অশ্রুবিন্দু'।

জয়তু হুমায়ুন আজাদ, জয়তু।

**বদরুল বোরহান, টোকিও, জাপান**

সুইডেন

# জনসংখ্যা ৯০ লাখ

গত ১২ আগস্ট (২০০৪) দুপুর ২টা ৫৮ মিনিটে স্টকহোম দানর্ড্রিদ হাসপাতালে এক শিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে সুইডেনের জনসংখ্যা পুরো ৯ মিলিয়নে এসে পৌঁছেছে। সুইডেনের প্রতিটি দৈনিক জনসংখ্যা বিষয়ক খবরটি বিশেষ যত্নসহকারে প্রকাশ করে। স্টকহোমের তিনটি দৈনিক 'দগেন্স নিহেতার', আফতন ব্লদেট' ও 'স্টকহোম সিটি' দুটি হাসপাতালে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন শিশুর জন্মগ্রহণের কথা প্রকাশ করে, যারা ৯০,০০০০০ নাম্বার বিশিষ্ট শিশু। তবে সেটা বড় কথা নয়, সুইডেনের জনসংখ্যা ৯ মিলিয়নে বা ৯০ লাখে এসে পৌঁচেছে এটিই বড় কথা। পত্র-পত্রিকাগুলো গুরুত্বসহকারে প্রধান শিরোনাম দিয়ে লিখেছে, বহিরাগতদের সাহায্য ব্যতীত সুইডেন ৯ মিলিয়নে পৌঁছাতে পারতো না। পারলেও অপেক্ষা করতে হতো আরো দীর্ঘ বছর। বর্তমানে সুইডেনের জনসংখ্যার তিনজনের একজন বহিরাগত। বহিরাগতদের মধ্যে ফিনল্যান্ড বা ফিনিসদের সংখ্যাই বেশি।

| | |
|---|---|
| ফিনল্যান্ড | : ১,৮৮,৫৭৫ জন |
| যুগোস্লাভ | : ১,৩৯,৪২৪ |
| ইরাক | : ৬৮,৩১৪ |
| ইরান | : ৫৩,৩৫১ |
| নরওয়ে | : ৪৫,০৬৬ |
| পোল্যান্ড | : ৪১,৬৯৪ |
| ডেনমার্ক | : ৪১,০৬৫ |
| জার্মান | : ৩৯,৭৪৩ |
| তুর্কি | : ৩৪,৩২৬ |
| চিলি | : ২৭,৫৯৩ |
| বাংলাদেশী | : ৬০০০ থেকে ৭০০০ মাত্র। |

জনসংখ্যার এক তথ্যে দেখা যায়, ১৭৬৭ সালে সুইডেনের জনসংখ্যা ছিল মাত্র দুই মিলিয়ন, ১৮৩৫ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় তিন মিলিয়নে। ১৮৬৩ সালে চার মিলিয়ন, ১৮৯৭ সালে পাঁচ মিলিয়ন, ১৯২৩ সালে ছয় মিলিয়ন, ১৯৫০ সালে সাত মিলিয়ন, ১৯৬৯ সালে আট মিলিয়ন এবং ২০০৪ সালে (১২ আগস্ট) ৯ মিলিয়ন। পত্র-পত্রিকাগুলো বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে আশা প্রকাশ করেছে আগামী ২০২৭ সালে হয়তো সুইডেনের জনসংখ্যা একটি সম্মানজনক পর্যায়ে ১০ মিলিয়নে পৌঁছাতে পারে। তবে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। নর্ডিক দেশগুলোর মধ্যে সুইডেন জনসংখ্যা বর্ধিত দেশ হলেও আজ থেকে একশ' বছর আগে ১৯০৪ সালে সুইডেনের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫২,৬০,৮১১ জন। বিগত ১০০ বছরে জনসংখ্যা খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। তার কারণ হিসেবে দেখা যায় ১৭৭৩ সালে অপুষ্টি ও এপিডেমিতে মারা যায় ১০,৫০০০ জন। ১৮০০ সালের যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যাও কম নয়। ১৮৩৪ সালে কলেরায় মারা যায় ১২,৬০০ জন। ১৮৫০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ১৫ লাখ সুইডিশ দেশ ত্যাগ করে, এর মধ্যে ১২ লাখ উত্তর আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। মূলত ১৯৩০ সাল থেকেই বহিরাগতরা সুইডেনে আসতে থাকে এবং বসতি গড়ে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সুইডেনের দ্রুত শিল্পায়ন ও বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে উঠলে কর্মশক্তির যোগানদার হিসেবে বহিরাগতদের দ্রুত আগমন ঘটে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ এই তিন বছরের মধ্যে ৮০ হাজার ফিনিস সুইডেনে এসে বসতি স্থাপন করে, এরপর একে একে বসতি গড়ে তুলছে বিভিন্ন জাতি।

## দাগ হ্যামারশোল্ড বাড়ি

...ঐ লাল বাড়িটায় দাগ হ্যামারশোল্ডের জন্ম। প্রশস্ত রাস্তার ধারে লাল বাড়িটার দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালো পিয়া।

শীতের বিকেল পাঁচটা। আঁধার নেমে এসেছে চারদিকে। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় আঁধারটা গাঢ়। রাস্তার পাশের লাইনগুলোর আলো কুয়াশায় বাধা পাচ্ছে। তবু আলো-আঁধারে বাড়িটাকে স্বতন্ত্র মনে হলো। গন্তব্য ছিল vattern ও Munksjon-এর সঙ্গমস্থল। Vattern সুইডেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৮ মিটার উচ্চসম্পন্ন হ্রদটির আয়তন ১৯১২ কিঃমিঃ। ১২৮ মিটার সর্বোচ্চ গভীরতাসম্পন্ন ১৩৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ ও ৩১ কিঃমিঃ প্রস্থে প্রসারিত হ্রদটি দৈনিক প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার লোকের খাবার পানি সরবরাহ করে থাকে। পাশের হ্রদটি Munksijon. দুটি হ্রদের সঙ্গমস্থল, বিশেষ করে ভেত্তারেনের বিশাল তীরে গড়ে উঠেছে ইয়নশপিং শহর। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে শহরটির গোড়াপত্তন, তখন নাম ছিল 'ইউনাশপিং'। অতীতের 'ইউনাশপিং' কালক্রমে বর্তমান 'ইয়নশপিং'-এ রূপ নেয়। ভেত্তারেনের দীর্ঘ তীর ধরে 'ইয়নশপিং'-এ প্রবেশপথটি পর্যটকদের একান্ত আকর্ষণীয়। এই 'ইয়নশপিং'- এই দাগ হ্যামারশোল্ডের জন্ম।

গাড়ি একটু স্পিডে থাকায় লাল বাড়িটাকে ঠিকভাবে দেখা গেল না। তবে হ্যামারশোল্ডের নামটি স্মৃতিতে তড়িতাহতের মতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। মনে পড়ে কলেজ জীবনের কথা, দাগ হ্যামারশোল্ডের কবিতাসহ জীবনী বইটির কথা। বিশেষ করে ১৯৬১ সালে কঙ্গো শান্তি মিশনে যাবার কালে তৎকালীন উত্তর রোডেশিয়ার গভীর জঙ্গলে বিমান দুর্ঘটনার কথা। ঐ বিমান দুর্ঘটনার রহস্যের সমাধান আজও হয়নি।

১৯০৫ সালে 'ইয়নশপিং'-এর ঐ লাল বাড়িটায় দাগ হ্যামারশোল্ডের জন্ম। জন্ম সালটিই পাওয়া যায়, মাস ও দিন পাওয়া যায় না। দাগ হ্যামারশোল্ডের জন্ম ইয়ানশপিংয়ে হলেও তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে উপসলায়। ১৯৩৩ সালে উপসলা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যাশনাল ইকনোমিক্স ও আইনে স্নাতক হয়ে ব্যাংক অব সুইডেনের সেক্রেটারির পদ লাভ করেন। কিছুকাল ঐ পদে চাকরি করার পর ১৯৩৬ সালে অর্থ দপ্তরে আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়

বৈদেশিক নীতির প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেন। এরপরই তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ’সময় দাগ হ্যামারশোল্ড নম্র ব্যবহার ও দক্ষ ‘আলোচক’ হিসেবে কূটনীতিক মহলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে তার নাম প্রস্তাব করার প্রাক্কালেও তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তেমন পরিচিত ছিলেন না। জাতিসংঘের একজন নতুন সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়নের জন্য ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ সেক্রেটারি কাউন্সিলে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় দাগ হ্যামারশোল্ডের নাম প্রস্তাব করে বলা হয়, ‘for his skilful administration in a time of crisis, and for his flexibility and secret diplomacy’ এগারোটি দেশের মধ্যে দশটি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে। অনেক দ্বিধা নিয়ে দাগ হ্যামারশোল্ড জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে ১৯৫৩ সালে নতুন পদ গ্রহণ করেন। ‘with a strong feeling of my own incapability I hesitate receivibg this nomination, but I believe I can not refuse to take on this take if the general assembly would follow the suggestion of the secretary council. Which I am very honoured of.’ জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরপরই ১৯৫৪ সালে তার ওপর এক বিরাট দায়িত্ব এসে উপস্থিত হয়। কোরিয়ার যুদ্ধে ১৫ জন আমেরিকান বৈমানিক চীনের হাতে বন্দি এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। ১৯৫৫ সালে দাগ হ্যামারশোল্ড সরাসরি চীনে উপস্থিত হন এবং দীর্ঘ চার দিনব্যাপী প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দেবার গুজব শোনা গেলেও চীন গুজবে পা দেয়নি। কিন্তু দাগ হ্যামারশোল্ডের পঞ্চাশ বছর পূর্তির দু’দিবস পর দেরিতে হলেও তিনি চীনা উপঢৌকন লাভ করেন। চীন থেকে শুভেচ্ছা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানানো হয়, চীন ১৫ জন আমেরিকান যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। চৌ-এন-লাই শুভেচ্ছা বাণীতে আরো জানান, ‘শুধু সেক্রেটারি জেনারেলের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্বের জন্য।’ দাগ হ্যামারশোল্ড ১৯৫৬ সালে সুয়েজ যুদ্ধ, লেবানন সংকট ও লাউস সংকটেও দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬০ সালের ৩০ জুন বেলজিয়ান কলোনি কঙ্গো ব্যাপক হত্যা ও রক্তপাতের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করে। অর্থশালী প্রভিন্স কিন্সাসায় ভাড়াটে সৈন্য ও বেলজিয়ানদের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। ১৪ জুলাই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এক ঘোষণার মাধ্যমে বেলজিয়ান সৈন্যবাহিনীকে কঙ্গো ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে সেক্রেটারি জেনারেল কঙ্গোতে জাতিসংঘ বাহিনী পাঠানোর দায়িত্ব লাভ করেন। দাগ হ্যামারশোল্ড দু’দিনের মধ্যেই কঙ্গোতে যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি স্থাপনে জাতিসংঘ বাহিনী পাঠান এবং কঙ্গো বৈদেশিক অপশক্তির হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। কঙ্গোর গৃহযুদ্ধে কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট কাশাউবু ও প্রধানমন্ত্রী লুলুম্বা নিহত হন। লুলুম্বার পতনে সোভিয়েট ইউনিয়ন নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভের সঙ্গে দাগ হ্যামারশোল্ডের অব্যক্ত বিরোধের সৃষ্টি হয়। নিকিতা ক্রুশ্চেভ হ্যামারশোল্ডের পদত্যাগ দাবি করে বসেন। ক্রুশ্চেভের এই অযৌক্তিক দাবির বিপক্ষে জাতিসংঘভুক্ত সদস্য দেশগুলো দৃঢ় সমর্থন নিয়ে দাগ হ্যামারশোল্ডের পেছনে এসে দাঁড়ায়। ১৯৬১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কঙ্গোর পার্শ্ববর্তী দেশ উত্তর রোডেশিয়ায় এক শান্তি মিশনে যাবার সময় কঙ্গোর গভীর অরণ্যে বিমান দুর্ঘটনায় দাগ হ্যামারশোল্ড প্রাণ হারান। মৃত্যুর পর ১৯৬১ সালে দাগ হ্যামারশোল্ডকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়।

দাগ হ্যামারশোল্ডের পিতা হলমার হ্যামারশোল্ড ছিলেন আইনের অধ্যাপক, সংসদ সদস্য এবং ১৯১৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ ১৯১৭ পর্যন্ত সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পিতার থেকে পুত্রই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। উপরন্তু, দাগ হ্যামারশোল্ড ছিলেন একাধারে লেখক, অনুবাদক ও সুইডিশ একাডেমির ১৮ জন সদস্যের একজন।

পরদিন দুপুরেই ভেত্তারেনের তীরে শেষ মাথায় এসে উপস্থিত হলাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঠান্ডা বাতাস। ঘন মেঘলা ভেত্তারেনের আকাশ। উত্তাল তরঙ্গ ভেত্তারেনে। ঢেউগুলো স্বশব্দে আছড়ে পড়ছে তীরে। ভেত্তারেনের শেষ মাথা ও দু’পাশে গড়ে উঠেছে ইয়নশপিং শহর ও আবাসিক এলাকা। তীর ঘেঁষেই পিচঢালা পায়ে হাঁটা পথ। এই পথ সোজা চলে গেছে শহর পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্কুলে। পিয়া জানালো আর একটু এগুলেই দাগ হ্যামারশোল্ডের বাড়ি। লাল বাড়িটি। বাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পেছনে ভেত্তারেনের অশান্ত ঢেউ। বাড়ির সম্মুখে প্রশস্ত পথ ও বাড়ির গায়ে একটি পিতলের ফলক। ফলকে লেখা :

91 A
Forenta Nationernas Generalsekreterare
DAG HAMMARSKJOLD
1905 Foddes i detta hus 1961
levsa att din i sista stund alla andra grata
Och du ar den ende som icke har en tar att falla!
বাড়ি নং ৯১/এ
জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল
দাগ হ্যামারশোল্ড
* ১৯০৫ সালে এই বাড়িতে জন্ম ১৯৬১
বেঁচে থাক, জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি যেন অন্যরা অশ্রু ঝরায়
শুধু তুমিই একজন যার অশ্রু ফেলার কিছু নেই!

**লিয়াকত হোসেন**
**সুইডেন**

---

†¯ú ı ন

# প্রবাসীদের জন্য সুখবর

স্পেনে বাংলাদেশ অ্যাম্বাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি তারেক মাহমুদের সঙ্গে প্রবাসীদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার এজেন্ডা ছিল ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প প্রসঙ্গে। বাংলাদেশ ও ভারতের যে ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী আছে তার ৫৩টি নদীর পানিই ভারত সরকার এখন আটকে দিয়ে গতিপথ পরিবর্তন করে প্রতি বছর ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নিচ্ছে। যা Un water convention (1947) Helsinki Rules (1966) কিংবা Biodiversity convention (1992) সবগুলোরই পরিপন্থী। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আমাদের সার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি, কৃষি, পরিবেশ আর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ভারত এই অপতৎপরতায় নেমেছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে এই ক্ষতি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিবেশে গ্যাসিয়স পদার্থের জন্য ক্ষতিকর। উক্ত প্রকল্প বন্ধ করতে United Nation Organigation-এর International Water Convention আইনে নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের পানি হিস্যা সমানভাবে বন্টন করে বিশ্বের পরিবেশ ও বাংলাদেশকে রক্ষা করতে জাতিসংঘের মহাসচিব এবং World Bank, IMF ব্যাংকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করতে দরখাস্ত দেয়া এবং আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদন করার জন্য প্রবাসীরা উদ্যোগ নেন। এ ব্যাপারে অ্যাম্বাসির মতামত জানতে চাইলে তারেক মাহমুদ উক্ত প্রস্তাবটির প্রশংসা করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আশ্বাস দেন। আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রদূতসহ দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনায় বসবেন এবং যথা শিগগির একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারেক মাহমুদ একটি সুখবর দেন যে, এ বছরই স্পেনের অ্যাম্বাসি বাংলাদেশে স্থাপিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও স্পেনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বৃদ্ধি পাবে। ভিসা সংগ্রহে আর দিল্লি যেতে হবে না।

**মোঃ আঃ জলিল চৌধুরী, C/Ramon Caca Buig-62-By-B, 280053, Madrid, Spain**